Loka Kalyan Parishad

পরিবেশমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ

ব্যবহারের সহজ পাঠ

১

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা

(CRP ও মহিলা কিষাণদের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা)

লোক কল্যাণ পরিষদঃ ২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৬, ফোনঃ ০৩৩ – ২৪৬৫ ৭১০৭ / ৪০৬০৫০৩৬ / ৬৫২৯১৮৭৮

Email: lkpmksp2013@gmail.com, lkp@lkp.org.in, lokakalyanparishad@gmail.com, **Website:** http://www.lkp.org.in

ভূমিকা

মাটি জীব জগতের ভিত্তি, উদ্ভিদ সরাসরি মাটির উপর নির্ভরশীল- মাটি থেকেই বেশীর ভাগ পুষ্টি সংগ্রহ করে। আর প্রাণীকুল বেঁচে থাকার জন্য, খাবারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কাজেই মাটির স্বাস্থ্যের উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মাটি। বয়ে এসেছে প্রাণী জগতের ধারা মাটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের লোভ ও অজ্ঞানতার ফলে মাটি হয়ে পড়েছে দুর্বল। সৃষ্টিকে সুস্থায়ী, টেকসই করতে হলে মানুষেরই দায়িত্ব নিতে হবে। শিখতে হবে সুষ্ঠ, পরিবেশমূখী মাটির ব্যবহার। বুঝতে হবে মাটির জীবন।

এই পুস্তিকাতে মাটিকে বোঝার ও সুস্থায়ী ব্যবহারের ভাবনা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্তর্গত ‘আজীবিকা মিশন’ ও ‘আনন্দধারা’-র যৌথ উদ্যোগে ‘মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা’ প্রকল্পটি লোক কল্যাণ পরিষদ সারা রাজ্যের ৫টি জিলা, ১১টি ব্লক ও ৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬০ হাজার মহিলা কিষানদের সাথে নিয়ে রূপায়িত করছে। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা-টি প্রকল্পভূক্ত মহিলা কিষাণ সম্প্রদায় ও তৃনমূল স্তরের প্রশিক্ষণ কর্মী সি.আর.পি / পি.পি. –দের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদক

লোক কল্যাণ পরিষদ

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP)

একটি জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) এর উপপরিকল্পনা

গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মহিলাদের 'মহিলা কিষাণ' হিসাবে সামাজিক পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জীবিকার উন্নয়ন।

উন্নয়ন উদ্যোগের প্রক্রিয়াঃ

ক) 'মহিলা কিষাণ' সংগঠিত হবেন এবং যৌথ সিদ্ধান্ত নেবেন –স্থানীয় ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কি ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।

খ) খরা প্রবণ অঞ্চলের উপযুক্ত বৃষ্টি নির্ভর ও সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাপনাঃ যেমন – কম জলের ফসল চক্র, অপ্রচলিত উপযুক্ত বহুবর্ষজীবী ফসল, উপযুক্ত ঐতিহ্যপূর্ণ বনেদী ফসলগুলির পুনঃপ্রচলন, ডাল ও তেলবীজ ইত্যাদির উৎপাদন, প্রচার, প্রসার ও প্রচলনের সহায়তা।

গ) চাষকে সুস্থায়ী করার লক্ষ্যে নিবিড়, বহুমূখী ও সুসংহত (Integrated System) প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা করা।

ঘ) সরকারি, বেসরকারি জলাভূমি, জমি ইত্যাদিতে অংশীদারির ভিত্তিতে দলগুলিকে যৌথ চাষ ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটানোয় নিয়োজিত করা।

ঙ) খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ, মূল্যমান বাড়ানো ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর উদ্যোগে একটি স্থিতিশীল উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সঠিকভাবে সম্পাদনার ফলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্ত্বার সাথে সাথে মহিলা কিষাণের আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

উন্নয়ন উদ্যোগের বিষয় ভিত্তিক কৌশলঃ

ক) মাটি ও জমির স্বাস্থ্য উদ্ধার ও উন্নয়ন

- ✓ জমির আল বাঁধা, পুকুরের পাড় বাঁধা ও ব্যবহার যোগ্য করা, সারা বছর ভূমির উপর জৈব ও ফসলের ঢাকনা, মাল্‌চের ব্যবহার ইত্যাদি
- ✓ জমির নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ✓ খামারের বর্জ্য পুনর্নবিকরণ ও ব্যবহার, সবুজ সার, জৈব সার ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ানো
- ✓ শস্য পর্যায়ে ডাল জাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্তি

খ) ভূমি ও জল সংরক্ষণ – ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন

- ✓ জমির সমোন্নত আলে ফসলের ঢাকনা, উৎপাদন
- ✓ জমির সমোন্নত আল তৈরি, আল শক্তপোক্ত করা
- ✓ মজা জলাশয় উদ্ধার ও নতুন জলাশয় খনন
- ✓ মাঠ কুয়া, শোষক কুয়া, (সোক পিট), জলধারণ ব্যবস্থা তৈরি

গ) ব্যয় সাশ্রয়কারী সুস্থায়ী চাষ প্রযুক্তি

- ✓ ভেষজ কীটনাশক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ✓ রাসায়নিক সার, বীষের ব্যবহার কমিয়ে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা
- ✓ জৈব সার, জীবাণু সার উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানো – আয় করা

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদজনক কাজের বিকল্প

- ✓ বিষমুক্ত চাষ ও খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ✓ রাসায়নিক বিষের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা, মুখোস, হ্যান্ড গ্লাভ্‌স, যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা

ঙ) জীব বৈচিত্র সুরক্ষা – সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলন

- ✓ পছন্দ সই, উপযুক্ত বনেদী ফসলের প্রচলন, পুনঃপ্রচলন

- ✓ মহিলা কিষাণের দলীয় বীজ ভাণ্ডার তৈরি, প্রসার – কন্দ, মূল, ছোট দানা শস্য ইত্যাদি

চ) পরম্পরাগত জ্ঞান ও কৌশলের প্রসার ও প্রচার

- ✓ মহিলা কিষাণদের জন্য পরম্পরাগত সুস্থায়ী চাষের পরিবেশ সম্পর্কে অনুশীলন
- ✓ বহুতল চাষ ব্যবস্থাপনা, বহুমূখী সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থাপনা – অনুশীলন, প্রচার ও প্রসার

ছ) পরিবেশ পরিবর্তন, উষ্ণায়ণ ইত্যাদি নিরসনে বহুমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রচার ও প্রসার

- ✓ কৃষি ভিত্তিক বনসৃজন – রাস্তা, খাল, নদী, রেল পাড়, পতিত জমি ইত্যাদিতে কিষাণ বন (ফল, পশুখাদ্য, জ্বালানী, সার উৎপাদনকারী, আসবাবী বৃক্ষাদি) তৈরি

জ) উপরোক্ত বিবিধ কার্যক্রম বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে মহিলা কিষাণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার মান উন্নত করা

ঝ) সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রসারের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ তৃণমূল স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত নিবিড়ভাবে সক্রিয় করা

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	চাষবাস ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা – বর্ত্তমান চাষের সমস্যা	১
২	চাষকে সুস্থায়ী করার কৌশল	৩
৩	মাটির উর্বরতা ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার ধারণা	৭
৪	সুসংহত কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ	৯
৫	গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম পরিকল্পনার ভাবনা	১১
৬	প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাব্য কাজ (গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে কি কি করা যাবে, কিভাবে?)	১৫

বর্তমান চাষের সমস্যা

বর্তমান চাষ ব্যবস্থা হচ্ছে অত্যাধিক কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, জল ও শক্তি ব্যবহার করে এবং বাজারের খেয়াল রেখে গুটি কয়েক উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির একক চাষ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন মাটি, জল, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক বীজ, শক্তি ও তার উৎস্য, ফসল ও জাত বৈচিত্র এর সাথে উদ্ভুত সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে এভাবে দেখা যেতে পারে বা ভাগ করা যেতে পারে।

মাটি :

১) ভূমিক্ষয় ও মাটির উর্বরতা হ্রাস।
২) ভারী যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটি জমাট বাঁধা।
৩) জল জমা
৪) লবণাক্ততা/অম্লতা বৃদ্ধি
৫) জৈব বস্তু ও অণুজীবের পরিমাণ হ্রাস।
৬) অণুখাদ্যের ঘাটতি
৭) মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া।

জল :

১) ভূর্গভের জল অত্যাধিক উত্তোলনের ফলে -
   ক) মাটির তলার জলের স্তর নেমে যাচ্ছে।
   খ) সমুদ্রের উপকূলে মাটির তলায় নোনা জল ঢুকছে ও সেই জলে জমি নোনা হচ্ছে।
২) জলের অত্যাধিক ব্যবহার ও অপচয় তার সাথে পানীয় জলের অপচয় ও অভাব।
৩) মাটির নীচের স্তরের জল যাওয়ার পথগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৪) বৃষ্টির জল বাধাহীনভাবে বয়ে যেতে দেওয়া ও তার অদক্ষ ব্যবহার ও অপচয়।
৫) অত্যাধিক সেচের ফলে মাটি নোনা হচ্ছে।
৬) জল ব্যবহারে সাম্যের অভাব।
৭) বিশেষ স্থলে আর্সেনিক নাইট্রেট, ফ্লোরাইড ইত্যাদির দ্বারা জল দূষণ।

রাসায়নিক সার :

১) কাঁচামালের উৎস সীমিত
২) দাম বাড়ছে ও বাড়বে যার সবটাই আমাদের দেশের উপর নির্ভরশীল নয় -আমদানী নির্ভর।
৩) খুব কম কাজে লাগে, বেশিরভাগটাই ধুয়ে বা উবে নষ্ট হয়ে যায়।
৪) মাটির উপরের ও নীচের জল ও বায়ু দূষণ হয়।
৫) অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে গাছের/ফসলের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও রোগ পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়।
৬) গাছের নিজস্ব খাদ্য সংগ্রহের প্রবণতাজনিত ক্ষমতা কমে যায়।
৭) শক্তি সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা নয়।
৮) মাটির জীবনীশক্তি ক্ষয় পাচ্ছে।

রাসায়নিক বিষ :

১) ব্যবহারকারীর শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি।
২) খাদ্যে বিষ থেকে যায় ।
৩) মাটির উপরের জল দূষণের ফলে মাছ, ব্যাঙ, কেঁচো ইত্যাদির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।
৪) ক্ষতিকর রোগ পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে।
৫) উপকারি প্রাণী, কীট, জীবাণু ইত্যাদির বিনাশের ফলে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভারসাম্য নষ্ট।
৬) অপরিহার্য্য নয় - মাত্র ২০০ ভাগের এক ভাগ শত্রু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।
৭) সহস্র বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা চাষ ব্যবস্থা ও জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে।

শক্তি :

১) সীমিত শক্তির উৎস্যগুলির অত্যাধিক ব্যবহার।
২) দাম ক্রমাগত বাড়ছে যার অনেকটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে - আন্তর্জাতিক চাপে নিয়ন্ত্রিত হয়।
৩) বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দূষণের বৃদ্ধি - পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে।
৪) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে গুরুত্বের অভাব ও প্রাথমিকস্তরে উচ্চমূল্য - সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে সীমিত।
৫) জ্বালানীর জন্য বনের উপর অত্যাধিক চাপ ও পশু খাদ্যের অভাব - বন্য প্রাণীর বাসভূমির অভাব।

বৈচিত্র্য :

১) একক চাষের ফলে ঝুঁকি বেড়ে গেছে।
২) কেবলমাত্র উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রীড লাগানোর ফলে বহু দেশি প্রজাতি লুপ্ত।
৩) যে খাদ্যের (ফসল ও গাছের) আপাতত বাজার মূল্য নেই, অথচ খাদ্য/ব্যবহারমূল্য অত্যাধিক তাদের উৎপাদন হ্রাস।
৪) সব ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা দ্রুত কমেছে।
৫) উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রীডের গুণাগুণগুলি অস্থায়ী।
৬) ওষধি গাছ, ফলমূল হারিয়ে যাচ্ছে, আহরণ হচ্ছে পূননবীকরণ হচ্ছে না।
৭) ভবিষ্যত উদ্ভিদ প্রাণী প্রজননের ও উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বংশসূত্রগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক :

১) আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়ে গেছে।
২) একই এলাকার বড় ও ছোট চাষির মধ্যে বৈষম্য বেড়ে গেছে।
৩) সার, তেল, বীজ সরবরাহকারী শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান লাভ করে চলেছে।
৪) চাষের প্রকৃত আয় (লাভ) কমেছে।
৫) উর্বর চাষের জমি কমে যাচ্ছে।
৬) বড় বাঁধ ও শিল্প, উর্বর চাষের জমি অধিগ্রহণ করার ফলে অনেক চাষি উচ্ছেদ ও নিঃস্ব হয়ে গেছে -যাচ্ছে
৭) প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপে চাষের নামে বিভিন্ন ভরতুকী দেওয়া চলছে। যার ফলে ভুল ও অপচয়কারী পদ্ধতি টিকে থাকছে।

৮) চাষ বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। চাষির ভূমিকা নগন্য ফলে পারিবারিক চাহিদা উপেক্ষিত।
৯) ভরতুকীর সুফল -উপকরণ প্রস্তুতকারী ভোগ করেছে, চাষি পাচ্ছে না।
১০) খাদ্যাভাস ও ফসল উৎপাদন বৈচিত্র্যজনিত অভাব সংস্কৃতিকে আঘাত করছে।
১১) কৃষি ও শিল্পে পুঁজি নিয়োগের বৈষম্য কর্ম সংস্থানের হতাশা এনেছে।
১২) কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতার ও গুরুত্বের অভাবে সামাজিক বৈষম্য এসেছে।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

চাষকে সুস্থায়ী বা টেকসই বা পরিবেশমুখী করার লক্ষ্যে কি কি পদ্ধতিগত কৌশল বা টেকনিক নেওয়া সম্ভবঃ

মাটি ও জল সংরক্ষণ :

১) সমতল জমিতে আল এবং ঢালু জমিতে সমোন্নত (কনট্যুর) আল বাঁধা ও উপযুক্ত নিকাশী নালা।
২) আলে অথবা ঢালে আড়াআড়ি গাছ, ঘাঁস লাগানো।
৩) ঢালের আড়াআড়ি জমি চষা, ফসল লাগানো।
৪) খাল, নালাতে ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া - জল ধরে রাখা।
৫) আচ্ছাদক ফসল চাষ করে জমি ঢেকে রাখা।
৬) অজৈব ও জৈব আচ্ছাদনের ব্যবহার করে জমি ঢেকে রাখা।
৭) পতিত চাষ - বৃষ্টির জল শোধন বাড়ানো, জল সঞ্চয়।
৮) কৃষি-ভিত্তিক বনসৃজন
৯) পর্যাপ্ত জৈব সারের ব্যবহার - মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো।
১০) সেচ ও মাটির রসের উপর নির্ভর করে উপযুক্ত ফসল নির্বাচন ও শস্যাবর্তন।
১১) পতিত জমিতে, ফল বাগান ও বনে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও জল বসানোর জন্য ছোট ছোট গর্ত কাটা। যার মাধ্যমে মাটির তলার জলের পরিমাণ বাড়বে ।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি :

১) রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমাতে থাকা ও বন্ধ করা।
২) সবুজ সার, সবুজ পাতা সার, তরল সার, অ্যাজোলা ও নীল সবুজ শ্যাওলা - প্রসার ও ব্যবহার।
৩) জীবাণু সার - রাইজোবিয়াম,অ্যাজোটোব্যাক্টর,অ্যাজোস্পিরিলাম, পি এস বি, প্রসার ও ব্যবহার।
৪) কেঁচো কম্পোস্ট উৎপাদন ।
৫) উচ্চ তাপ কম্পোস্ট।
৬) ফসলের অবশিষ্টাংশের ব্যবহার ও নাড়া বড় করে কাটা।
৭) ধনচে বীজের গুঁড়ো সার হিসাবে ব্যবহার।
৮) সারের প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার - রক ফসফেট,জিপসাম ইত্যাদি।
৯) জীবন্ত ও জৈব মাল্চ।
১০) পতিত চাষ।

১১) পুকুরের পাঁকের ব্যবহার।
১২) জীবাণু সার ও জৈব সার উৎপাদন, গোমূত্র ও ছাইয়ের ব্যবহার।

ফসল লাগানোর পদ্ধতি :

১) মিশ্রচাষ
২) শস্যাবর্তনে ডাল জাতীয় ফসল যুক্ত করা।
৩) রিলে চাষ/পয়রা চাষ
৪) বহুতল চাষ
৫) এলাকা ও অবস্থানভিত্তিক ফসল ও জাত নির্বাচন।
৬) ভিন্ন জাতের ফসল লাগিয়ে আলের ব্যবহার
৭) জৈব নিবিড় বাগান - উঁচু বেড,বৃত্তাকার বাগান, বহুতল বাগান।

ফসল বৈচিত্র :

১) একক ফসল ও একক জাতের চাষ একই জমিতে বিভিন্ন মরশুমে না করা।
২) অবহেলিত ও অপ্রচলিত ফসলের জাতগুলি যেমন বিভিন্ন ডাল, খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূলের চাষ ফিরিয়ে আনা।
৩) নতুন নতুন উপযোগী ফসলের চাষ শুরু করা।
৪) কৃষি ভিত্তিক বনসৃজন।
৫) বনৌষধির চাষ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ (মাতৃ বাগান)।
৬) বিভিন্ন ফসল, ফলমূল ও ঔষধির বংশসূত্র সংরক্ষণ (মাতৃ বাগান/খামার)।
৭) বীজের বংশগত গুণমান উন্নয়ন ও তার ব্যবহার।

রোগ পোকা ও অন্যান্য কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ :

১) রোগপোকা সহণশীল জাত, সুস্থ, সবল বীজ ব্যবহার।
২) রাসায়নিক বিষ ব্যবহার বন্ধ করা।
৩) সুসংহত কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ -
- বীজ শোধনে নুন জল, গোমূত্র, রোদে শোধন, গরম জলে শোধন ইত্যাদি।
- বীজ তলায় গুলঞ্চ, ঢোল কলমী, নিম-করঞ্জ, - রেড়ি খোলের ব্যবহার (অখাদ্য খোল)।
- নিমতেল, পাতা ও বীজ, আতা পাতা, পাটবীজ, তামাক পাতা ইত্যাদি ভেষজের নির্যাস ব্যবহার।
- আলোক ফাঁদ।
- যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (নিজে হাতে বাছাই; পাখী বসার ব্যবস্থা ইত্যাদি)।
- রোগাক্রান্ত পোকার নির্যাস ব্যবহার
- আলে ও ফসলের সাথে ধনচে, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা (বার্ড পার্চার)
- গন্ধী পোকা দমনে পচা কাঁকড়ার ব্যবহার
- ধানের জমি, নালা, খাল বিলে জংলী মাছের চাষ
- ফাঁদ-ফসল/গাছ উদাহরণ-গাঁদা, রেড়ি, করঞ্জ, রসুন, পেঁয়াজ, গুলঞ্চ ইত্যাদি।

৪) জীবন্ত বেড়া

৫) ফসল লাগানোর পদ্ধতি
- স্কিপ রো প্ল্যান্টিং
- মিশ্রচাষ
- লাগানোর সময়ের হেরফের করা

৬) গুদামজাত শস্য, বীজ সংরক্ষণে -
- নিমবীজ ও পাতার গুঁড়ো, নিম বা সরষে ইত্যাদির তেল, নিশিন্দা পাতার ব্যবহার
- ছাই, চুন, বালি ইত্যাদি, লংকা, পুদিনাপাতা, তামাক পাতার ব্যবহার

৭) কীটশত্রু দমনে সহজলভ্য পরিবেশমুখী বস্তুর ব্যবহার -
সাবান জল, কেরোসিন তেল, শুকনো ছাই, গোমূত্র ইত্যাদি।

৮) সাথী ফসল
- ছোলা ও মুসুরের সাথে তিসির মিশ্রচাষ, ভুট্টার সাথে রমা কলাই, মাসকলাই, বরবটি কলাই, টমেটোর সাথে গাজর, আলুর সাথে বিন ইত্যাদি।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

প্রাকৃতিক সম্পদের ধরণ

ফুরন্ত	অফুরন্ত
জমি, মাটি, খনিজ	জল
জ্বালানী : খনিজ, বনজ, কৃষিজ	বাতাস
	সূর্য্যের আলো

আমাদের দেশে শ্রমশক্তি এখনও অফুরন্ত

প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা

বন:

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ৩০% বনভূমি। আমাদের (পশ্চিমবঙ্গে) আছে মাত্র ৯%, ফলে বায়ু দূষণ বাড়ছে, তাপমাত্রা বাড়ছে, ভূমিক্ষয় বাড়ছে, বৃষ্টিপাত কমছে বা অনিয়মিত হচ্ছে। উপযুক্ত প্রচুর জমি পতিত পরে আছে - বনায়নের প্রচুর সুযোগ আছে।

ভূমি:

চাষের জমি কমে যাচ্ছে, অত্যাধিক চাপের ফলে ও ভূমিক্ষয়ের ফলে (ভূমি দূষণসহ) মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমছে, চাষের খরচ বাড়ছে, লাভজনক থাকছে না। উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রসারের অভাবে জমি পতিত পরে আছে।

জল:

পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে জীবন ও জীবিকার উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। খড়া, বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। গড় বৃষ্টিপাত একই আছে। সেচের কাজে ভূগর্ভের জল অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে মাটি দূষণ হচ্ছে, পানীয় জলের অভাব বাড়ছে, জল দূষণ বাড়ছে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থাদি কমেছে, প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ছে না। জল সংরক্ষণের অফুরন্ত সুযোগ আছে।

সৌরশক্তি:

অফুরন্ত ও সকল শক্তির উৎস্য। ব্যবহার প্রায় নেই। সৌরশক্তি বারোমাস বা জৈব সম্পদ উৎপাদনের একটি প্রধান রসদ। উৎপাদন ও ব্যবহারের সুযোগ অফুরন্ত।

বাঁচিয়ে রাখো পৃথিবী মাকে

বসুন্ধরা মায়ের কোলটি ছোট
দেবার ও আছে সীমা,
ঘটছে যা - তা জটিল হবে
শুনবে, না কি মানা ?
কয়লা পোড়াও, ধোয়ায় ভরাও
বন পুড়িয়ে ধূলো ওরাও,
শুকনো কূয়ো, শুকনো খনি,
নদ নদী ভরে দূষিত পানী,
সাগর ফোঁসে, জমি ভাসে,
মানুষ মাতে ওড়ার নেশায়
হানাহানি লুটের নেশায়
শ্মশান শান্তি দুয়ার গোড়ায়।

- কেনেথ বল্ডিং

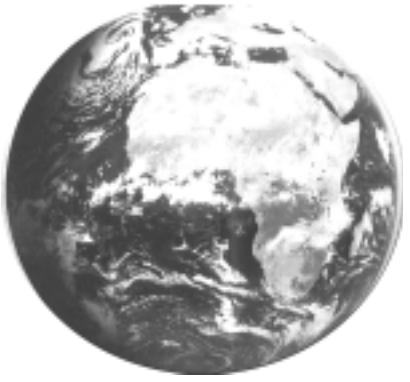

ধরিত্রী মা-ই আমাদের একমাত্র আবাস,
যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আমরাও পতিত হব মৃত্যু মুখে

মাটির উর্বরতা ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার ধারণা

মাটি কি?

কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি ও পরিবেশের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কঠিন শিলাস্তর, শিলাখন্ড, নানা রাসায়নিক, জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে চুর্ন-বিচুর্ন হয়ে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তৈরী হয়েছে তেমনি কোটি কোটি জীবাণু, বীজাণু, জীব, অনুজীব ক্রমাগত নিজস্ব জৈবনিক ক্রিয়ার সাহায্যে ও উপস্থিতিতে শিলাকণাগুলিকে মাটিতে পরিণত করে রেখেছে। এই সব জীবাণু আদি অনুপস্থিত থাকলে ওই বস্তুকে মাটি বলা যাবে না। মনে রাখা প্রয়োজন ১ইঞ্চি মাটি তৈরী হতে কম করেও ৮০০-১০০০ বছর সময় লাগে।

মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা:

জমি বা মাটির গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে এদুটি কথা ব্যবহার হয়। ভাষাগতভাবে উর্বর মাটি মানে যে মাটি বিশেষ কতগুলি অবস্থায় ভাল উৎপাদন দিতে পারে। এটা শুধু মাটির নিজস্ব গুণ অর্থাৎ মাটিতে ফসলের খাদ্যের প্রাচুর্য্যকে বোঝায়। উর্বর মাটিতে ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সুষম প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও অন্যান্য বিশেষ অবস্থা, যেমন পরিবেশ (আলো, জল, বাতাস, তাপমাত্রা, জীবন ইত্যাদি) এর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোন জমির বা মাটির অর্থনৈতিক মূল্যায়ন অর্থাৎ কোনও বা বিভিন্ন ফসল কতটা উৎপন্ন হয় তার মান। কাজেই উর্বরতা ও উৎপাদিকা কথা দুটির মধ্যে তথাৎ আছে, এটা বোঝা দরকার।

মাটি উদ্ভিদের (ফসল) বৃদ্ধির অপরিহার্য্য উপাদান:

উদ্ভিদের বৃদ্ধি মানে সম্পূর্ণভাবে অথবা কোন বিশেষ অঙ্গের পুষ্টি ও উন্নতি। মাটির জন্মগত উপাদান (Genetic Factor) ছাড়াও পরিবেশ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য্য বস্তু যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন,জল ও খনিজ খাদ্য মাটি ও বায়ুমন্ডল থেকে সরাসরি ও সাহায্যকারীর মাধ্যমে এবং সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য উপাদানগুলি হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, মলিবডেনাম,বোরন ও ক্লোরিন। বর্তমানে সোডিয়াম, কোবাল্ট, ভ্যানাডিয়াম, সিলিকন, সিলেনিয়াম, গ্যালিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়োডিন অপরিহার্য্য খনিজ খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এগুলি বেশীরভাগই অত্যন্ত কম পরিমানে হলেও অপরিহার্য্য এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যদিও এদের সকলের ভূমিকা বিশেষভাবে জানা যায়নি।

মাটি ও পরিবেশে এই সব বস্তু থাকলেও উদ্ভিদ সবগুলি সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। মাটিতে বসবাসকারী জীবাণু, বীজাণু অনুজীব, জীবেরা এই সব বস্তুগুলিকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্য ও অন্যান্য পরিবেশগত উপাদান পর্যাপ্ত থাকলেও ওই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসবাসকারীরা (যারা মাটিকে জীবন্ত করে)অনুপস্থিত থাকলে মাটি উৎপাদনক্ষম হয় না। এটা বোঝা দরকার। এজন্য জীবন্ত মাটির ধারণাটি পরিস্কার থাকা দরকার।

ভূমিক্ষয়:

জমি বা মাটির অস্বাভাবিক ক্ষয়কে ভূমিক্ষয় বলা হয়। বৃষ্টি বা জলের স্রোতের ফলে, ঝড়ে, বাতাসে, মানুষ পশুপাখীর দ্বারা নানাভাবে জমির উপরের স্তরের মাটি ক্ষয় পেতে পারে। আবার অবৈজ্ঞানিকভাবে জমি ও মাটি ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয়কেও ভূমিক্ষয় হিসাবে ধরা হবে।

অস্বাভাবিক ভূমিক্ষয় তখনই হয় যখন কোনও নির্দ্দিষ্ট 'বাস্তু-পরিবেশ' মানুষ, পশুপাখীর দ্বারা বিঘ্নিত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিকভাবে ভূমিক্ষয় সহনশীলভাবে, সীমাবদ্ধভাবে হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক এবং চলতেই থাকবে।

ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ ও প্রকার:

ক) প্রাকৃতিক কারণ

১) **জল:** বৃষ্টির জল বাধাহীনভাবে মাটির উপরে আঘাতের ফলে ও বয়ে যাবার ফলে মাটির উপরিস্তর আলগা করে ও জলের স্রোতের সাথে বয়ে নীচু জমি, নালা, নদী, সাগরে নিক্ষেপ করে। এতে উপরের উর্বর মাটির স্তর যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি নীচু এলাকায় নিক্ষেপের ফলে উর্বর মাটি/জমি, নালা,নদীর তল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ধরণের ক্ষয়ের ব্যাপকতা অনুসারে ক্ষয়ের বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়:
স্প্ল্যাস (Splash), সিট, রিল, গালি, রিভার, নালা, সমুদ্রের পাড় ভাঙ্গন ও ক্ষয় হয়।

২) **বাতাস:** ঝোড়ো বাতাসে আলগা মাটি উড়িয়ে নিয়ে ধুলি ঝড় সৃষ্টি করে। এতে মাটি ক্ষয় হয় এবং অন্যত্র উর্বর মাটিকে ঢেকে দিয়ে নষ্ট করে।

খ. মানুষের সৃষ্ট ভূমিক্ষয়- মানুষের অপরিনামদর্শী নানা ক্রিয়াকলাপের ফলে ভূমিক্ষয় হয় বা ভূমিক্ষয় বাড়ে যেমন - বন ধবংস করা, ঢালু জমিতে পশুপালন, খনিজ সংগ্রহ ,রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি।

এধরণের ভূমিক্ষয় থেকে রক্ষা করার উপায়:

১) জমির আল বাঁধা ও উঁচু করা, আচ্ছাদন ও ফসল দিয়ে জমি ও আল ঢেকে রাখা
২) উঁচু-নীচু বা ঢালু জমিতে সমোন্নত আল (কনট্যুর আল)তৈরী করা ও জীবন্ত আচ্ছাদক ফসল লাগানো
৩) জমির/মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো-পর্য্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করা, মাটির সঞ্চিত রসে আচ্ছাদনকারীরা ফসল ফলান (পয়রা চাষ)। পশুচারণ বন্ধ করা/কমানো।
৪) ফসল, ঘাস ইত্যাদি দিয়ে মাটি সব সময় ঢেকে রাখা - আচ্ছাদন ফসল, মাল্চ, জীবন্ত মাল্চ ব্যবহার।
৫) পতিত জমিতে, অধিক ঢালু জমিতে (১৩-১৫% এর বেশী ঢালু) জমিতে কৃষিভিত্তিক বনায়ন, ফলচাষ, অন্তরবর্তী আচ্ছাদক ফসল, ঘাস ইত্যাদি লাগানো।
৭) আলে গাছ লাগানো - যেগুলি কাটা ও ছাটা সহ্য করতে পারে ও শিকড় গভীরে যায়, পাশে বিশেষ ছড়ায় না ফলে ঝোড়ো হাওয়া রোধ হয়।
৮) মিশ্র চাষ ও সুষ্ঠু শস্যাবর্তন করা। (আচ্ছাদক ফসল, অ্যালিক্রপিং, ষ্ট্রিপ ক্রপিং, ঘাস ইত্যাদি)
৯) মাঠ কূয়ো করে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও মাটির গভীরে জল বসার ব্যবস্থা করা, সঞ্চিত জলে জীবনদায়ী সেচের কাজ করা।
১০) নুড়ি পাথরের বাঁধ দিয়ে গালি বন্ধ করা ও ঘাস, ভ্যাটিভার (খসখস), বাবুই ঘাস ইত্যাদি গালির পাড়ে ও আড়াআড়ি লাগানো (চেক্ ড্যাম)।
১১) নালায় নুড়ি পাথরের বাঁধ দিয়ে জলের স্রোত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ও ধরে রাখা জল ব্যবহার করা ইত্যাদি।
১২) ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা ভিত্তিক ছোট ছোট জলধার তৈরী করে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও ব্যবস্থা করা।

ভূমিক্ষয় কমাতে হলে জল সংরক্ষণ/নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কাজেই একই সাথে ভূমি ও জল সংরক্ষণ দুটো কাজই হয়। এসব কাজগুলি করলে ঝড় বাতাসে ভূমিক্ষয়ও কমে।

সুসংহত কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার ধারণা

"কয়েকশো কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতিটি উদ্ভিদ প্রতিটি প্রাণী প্রজাতি সমভাবে দায়িত্ব পালন করে এসেছে। প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ প্রাণী প্রজাতির মধ্যে মানুষ মাত্র ১টি। তাই প্রকৃতি তার সুক্ষ্মতম প্রজাতির চেয়ে মানুষকে কোন অংশে বড় করে দেখে না। যে কোন প্রজাতি প্রকৃতির এই ভারসাম্যকে পরিবর্তন করতে চাইলে বা ধ্বংস করতে চাইলে প্রকৃতি তাকেও নিস্কৃতি দেবে না"-উৎস্য মানুষ ।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে কৃষিতে রাসায়নিক সার বিষের ব্যবহার বেড়েছে। ফসলের ক্ষতিকারক মাত্র ০.৫ শতাংশ প্রজাতির কীটপতঙ্গকে আয়ত্বে আনার জন্য অপরিনামদর্শী ও অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিষের ব্যবহার আজ প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ছিন্ন করতে চলেছে। এই ভয়াবহতার গতি প্রকৃতি যতই পরিস্কার হয়ে আসছে ততই বিকল্প পথের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে এবং কৃষি শত্রু ও সুসংহত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার (আই পি এম) আয়োজনকে, সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনার (আই সি এম) আয়োজনকে বিকল্প হিসাবে বেছে নিচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বিশ্রুত প্রায় কার্যকরী ব্যবস্থাগুলিকে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকেও সমন্বয়সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে। যাতে ক্রমাগত কৃষি উৎপাদনও ব্যাহত না হয় অর্থাৎ সুস্থায়ী থাকে এবং প্রকৃতির ভারসাম্যও যথাসম্ভব বজায় রাখা যায়।

আই পি এম বা সুসংহত কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কি?

ফসলের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি (জৈব নিয়ন্ত্রণ, পরিচর্য্যাগত নিয়ন্ত্রণ ও রাসায়নিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা) গুলির সমন্বয় সাধন করা।

কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণ করতে বিষ ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলা/বিষের ব্যবহার সীমিত করা।

আই সি এম বা সমন্বিত ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কি?

সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনাটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা। গোলা থেকে বীজ বার করার পর থেকে ফসল উৎপাদনের পর গোলায় বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত সময়কালে আই পি এমের ধারণগুলির সাথে সাথে মাটি, জল, পরিবেশ সুরক্ষায় দিকগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্ব সাধন করা। পরিবেশ (ইকো-সিস্টেম) ও তার সুরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে (ইকো ম্যানেজমেট) কে প্রাথমিকতা দেওয়া।

কাজেই আই পি এম সম্পূর্ণ চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি অংশমাত্র।

কেন?

এদের মানে রোগ পোকা ইত্যাদি কৃষি শত্রুর উপস্থিতি/ আক্রমণ স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমা অতিক্রম না করলে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। নিয়ন্ত্রক বন্ধুদের দ্বারা আপনিই নিয়ন্ত্রিত হয় ।দুটি একটি দেখা গেলেই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নেই। এদের শিকার করে বা খেয়ে যারা বাঁচে তাদের উপস্থিতি যাচাই করা দরকার।

বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত সময়কালে সুরক্ষার জন্য পরিচর্য্যাগত ধাপগুলি মেনে চললে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। রোপন/বপনের সঠিক সময়, নীরোগ বীজ ব্যবহার, সহনশীল জাত নির্বাচন, রাসায়নিক সার-বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা, ফসল রোপন বপনের ঘনত্ব বা দূরত্ব, নিয়মিত জৈব সার

ব্যবহার, শস্যাবর্তন ও মিশ্রচাষ করা ইত্যাদি।

মাটির উৎপাদিকা শক্তি/উর্বরতা বজায় রাখতে পারলে রোগপোকার আক্রমণ কম হয় (জীবন্ত মাটি)। রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে সুষম হারে ব্যবহার করা ও নিয়মিত জৈব সার ব্যবহার করা উচিৎ, এতে রোগপোকা কম হয়।

কিভাবে?

- নিরোগ ও পুষ্ট বীজ ব্যবহার করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে রোপন, বপন করতে হবে। অসময়ে নয়।
- নিয়মিত জৈব সার ব্যবহার করতে হবে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হলে অল্প পরিমাণে সুষম হারে ব্যবহার করতে হবে।
- একক ফসলের চাষ, একই ফসলের পর পর চাষ, অসময়ে চাষ (যেটা ব্যবসায়ের জন্য করা হয়) না করে সুষ্ঠু শস্যাবর্তন ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি অনুযায়ী চাষ করতে হবে।
- শত্রু ও বন্ধুর অনুপাত যাচাই করে ধৈর্য্য ধরে প্রথমে পরিবেশমুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তবেই প্রয়োগবিধি মেনে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা যাবে। নিয়ম না মেনে বিষ ব্যবহার করলে শত্রুপোকা সহনশীলতা বেড়ে চলে, আক্রমণ বাড়তে থাকে, নিয়ন্ত্রক বন্ধুদের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
- অতিরিক্ত সেচ দেওয়া উচিত নয়। নিকাশী ব্যবস্থাও ভালরাখতে হবে। মাটির ভিতরে বাতাস চলাচলের সুযোগ বাড়াতে হবে (মাটি আলগা রাখতে হবে)।
- মাটিকে সব সময় ঢেকে রাখতে হবে (আচ্ছাদন)। ফসল দিয়ে আচ্ছাদন করাই লাভজনক (সাথী ফসল)। অন্যান্য জিনিস (খড় কুটো, শুকনো পাতা ইত্যাদি) দিয়েও করা যাবে। প্রখর রোদ, ঠান্ডা গরমে মাটির জৈব পরিবেশ দুর্বল হয়, রসের অভাব হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম পরিকল্পনা ভাবনা

নভেম্বরের বিশেষ গ্রাম সভায় গ্রাম পরিকল্পনা পেশ ও পাশ করাতে হয়। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপরই দায়িত্ব এসেছে গ্রাম সংসদ এলাকার পরিকল্পনা করা, চুড়ান্ত করা, যেগুলি একত্র করে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা চুড়ান্ত হবে। কাজেই হাতে সময়ও বেশী নেই। এখনই পাড়ায় পাড়ায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির আলোচনা শুরু করতে হবে এবারের পরিকল্পনায় কি কি করা উচিৎ। পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা করে, স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে কি করা উচিৎ, কি করা স্থানীয়ভাবে সম্ভব, কোনটা আগে করা দরকার বুঝে খসড়া পরিকল্পনা করার কাজটি অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতে পারলে নভেম্বরে চুড়ান্ত করা সহজ হবে। গ্রাম পরিকল্পনা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা যাক -

গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের মানুষের সব থেকে আপন, সব থেকে কাছের সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরও শক্তিশালী করতে, কাজে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে পঞ্চায়েতের আইন কানুনে কিছু কিছু পরিবর্তন করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন হয়েছে। এর ফলে গ্রামের মানুষ গ্রাম সংসদে বসে গ্রামের সমস্যা, সুযোগ সুবিধাগুলি নিজেদের মত করে বুঝে গ্রাম পরিকল্পনা করার সুযোগ পেয়েছে। শুধু ১০-১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও গুটি কয়েক পঞ্চায়েত কর্মীর পক্ষে যা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঐ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গুলির পরিকল্পনাগুলি নিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে তৈরী করার এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাথে নিয়ে তাদের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের সুযোগ এসেছে। সরকারও গ্রাম পরিকল্পনাগুলি যাতে চাহিদা মত রূপায়ন করা যায় - চলতি সরকারী কর্মসূচির বাইরেও নি:শর্ত তহবিল সরাসরি পঞ্চায়েতের কাছে পাঠানোর কাজ শুরু করেছেন। কাজেই পরিকল্পনা তৈরী যত সঠিকভাবে করা যাবে, রূপায়নে মানুষের যত অংশগ্রহণ বাড়বে উন্নয়ন ততই সঠিক ও স্থায়ী হবে।

আমাদের একটা ধারণা আছে - পরিকল্পনা মানেই অনেক লেখা পড়া , অনেক কাগজ কলম, অনেক মাথার ঘাম লাগে যা গ্রামের সাধারণ মানুষ করতে পারবে না। আসলে তা নয়। গ্রামের মানুষের নানা অসুবিধা আছে, আবার সব গ্রামের অসুবিধাগুলি একই রকম নয়। কোথাও রাস্তাঘাটের অভাব, কোথাও খাবার জলের অভাব। কোথাও জল নিকাশের ব্যবস্থা নেই - খাল বিল পুকুর নালা মজে গেছে। কোথাও আবার স্কুল ভাল চলে না। স্বাস্থকেন্দ্র নামেই আছে ; এরকম আরও কত কি ! এরকম নানা অসুবিধা।

একটু ভাবা যাক - এসব অসুবিধা কি একই রকমভাবে একসাথে এখুনি মেটানো যাবে ? কে মেটাবে ? সবাই মিলে একটু গুছিয়ে যদি ভাবি ? যেমন -
সবার কাজ পাওয়া দরকার। এবার নিজেদের মনে প্রশ্ন করি -

সবাই সারা বছর কাজ পায় কি ? কতজন এবং কারা পায় না ? যারা কাজ পায় না তারা কি ধরণের কাজ করতে পারে? যে ধরণের কাজ যে যে করতে জানে তারা করে না কেন ? তারা সুযোগ পেলে করবে কি ? তাহলে অভাবটাই বা কি?

উত্তরগুলি যদি এরকম পাওয়া যায় -
গ্রামের ১৫০ টি পরিবারের মধ্যে ৭০ টি পরিবার সারা বছর কাজ পায় না। এরা কৃষি মজুর - জমি নেই। চাষের জমি পেলে চাষ করতে পারে। তবে সার বীজ লাঙল কেনার পুজি নেই। তাই বছরে ২-৩ মাস অনাহার অর্দ্ধাহারে থাকে বা ঋণ করে দিন গুজরান করে।

এবার উপায় খোঁজার পালা। মানে গ্রামে কি সম্পদ আছে - সরকারী বেসরকারী বেশ কিছু চাষের জমি, রাস্তার ধার, খালের পাড় স্থায়ীভাবে অথবা বছরের অনেকটা সময় খালি পরে থাকে। সেচের অভাব আছে। আবার বেশ কয়েকটা পুকুর, নালা বিল মজে গেছে, জল থাকে না। কিছু জমির মালিক আছে আমন ধান তোলার পর জমি ফেলে রাখে - মুনিস খাটিয়ে চাষ করে লাভ হয় না, তবে ভাগে পাওয়া যেতে পারে। চাষ করলে সরকারী দপ্তর থেকে বীজ সাহায্য পাওয়া যায়। পরামর্শ নেওয়া যায়। মজা পুকুর বিল সংস্কার করলে কিছু সেচের ব্যবস্থা তো হবে, সাথে মাছ, হাঁস, শাক-সব্জী, ফল ফসারীর গাছও করা যাবে। ৭০ টি আংশিক বেকার পরিবারও আছে যারা এসব কাজ করতে পারবে। গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পাশে থেকে সাধ্য মত সাহায্যও করতে পারবে। বেশ কয়েকজন ভাল চাষী গ্রামে আছেন যারা অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ দিতে আগ্রহী। স্থানীয় সরকারি আধিকারিকরাও আছেন।

এবার সবাই মিলে একটা পরিকল্পনার খসড়া করা যাবে। যেমন-

- ভূমিহীন চাষ মজুর পরিবারগুলিকে নিয়ে প্রতিবেশী ভিত্তিক চাষীর স্বনির্ভর দল গঠন করা -কটা দল হবে দায়িত্ব কে বা কারা নেবে
- দলগতভাবে কিভাবে কাজ করতে হয়, দলের সুবিধাগুলি কি ? কিভাবে দলের শক্তি বাড়ে বোঝানো, শেখানো - দায়িত্ব কে বা কারা,কবে থেকে নেবে
- যেসব জায়গা জমি চিহ্নিত করা গেল তাতে কোথায় কি ধরণের কি চাষ করা যাবে, দলের নিজেদের মধ্যে ফসলের ভাগাভাগি কিভাবে হবে ঠিক করা
- জমি মালিক, গ্রাম পঞ্চায়েত বা সরকারী দপ্তর, তাদের সাথে বসে জমি ব্যবহারের নিয়মকানুন,ভাগাভাগি, চাষের উপকরণ সহায়তা ইত্যাদি ঠিক করা
- সরকারী দপ্তরগুলি থেকে কি কি পাওয়া যাবে আলোচনা করে ঠিক করা
- নিজেরা কতটা স্বেচ্ছাশ্রম,কি কি উপকরণ দেবে, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের নুন্যতম কতটা পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া গেলে কাজটা সহজে করে ফলা যাবে, কিভাবে কারা তদারকি করবে, কখন কাজ শুরু হবে, পরিচর্য্যা ইত্যাদি কিভাবে হবে ঠিক করা
- গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, সরকারী দপ্তরের কর্মী ও আধিকারীকদের পরিকল্পনা জানানো, পরামর্শ নেওয়া, যোগাযোগ ও সহায়তা নিশ্চিত করা
- সর্বোপরি গ্রামের সবাইকে খসড়া গ্রাম পরিকল্পনা ও রূপায়ন বিষয়ে আলেচনা সভায় ডাকা, পরামর্শ নেওয়া - সহযোগিতা বাড়ানো
- যে খসড়া গ্রাম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ঠিক করা হল গ্রাম পঞ্চায়েতে জানানো ও পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় যুক্ত করানো
- পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা ও সহমত হওয়ার পর রূপায়নের কাজে হাত লাগানো
- সঠিক পরিকল্পনা করতে হলে সঠিক তথ্য দরকার। ধীরে ধীরে গ্রাম রেজিষ্টার তৈরীও করতে হবে।

কৃষি ও চাষ নির্ভর গ্রাম পরিকল্পনায় কতগুলি বিশেষ ধরণের কাজ এভাবেই করে গত দু'তিন বছরে ইলামবাজার, লাভপুর, বোলপুর, ইটাহার, কালচিনি ইত্যাদি ব্লক এলাকার ২০-২২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ সুফল এসেছে, সেগুলি আপনারা ভাবতে পারেন। যেমন -

- রাস্তার ধার, খালের পাড়, চাষের অযোগ্য পতিত জমিতে কৃষি ভিত্তিক বনসৃজন করা। এর মধ্যে থাকবে

ফল ফসারী খাদ্যের গাছ, পশুখাদ্যের উপযুক্ত গাছ, জ্বালানী হয় এমন গাছ, আসবাবী ও নানা নির্মাণ কাজে লাগে এমন নানা চাহিদার চারা তৈরী করা, দল বেঁধে লাগানো ও বন তৈরী করা। এলাকার স্বনির্ভর দলগুলি এসব চারা তৈরী করে নিজেদের এলাকায় লাগিয়েছে, স্থানীয়ভাবে কিছু বিক্রিও করেছে, বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচিতে সরবরাহ করে বেশ আয়ও করেছে। কতটা জায়গায় লাগানো হবে, ক'লক্ষ চারা সরকারী প্রকল্পে সরবরাহ করা যাবে আগাম পরিকল্পনা করেছে। বীরভূম জেলাতে স্বনির্ভর দলগুলি এর মাধ্যমে এবছর (২০০৫)চারা সরবরাহ করে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা আয় করেছে। নিজেরাই সব কাজ করেছে তাই গাছগুলি যত্নেই বাড়ছে। ইটাহার ব্লকের জয়হাট ও দুর্লভপুর পঞ্চায়েতে ১৩টি দলে ১১২টি পরিবার ২,৩৩,০০০ চারা তৈরী করে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিক্রি করে ২,৫০,০০০ টাকার বেশী আয় করেছে।

- এই চারা লাগানোর সাথে সাথে চারার সাড়ির দু'পাশে অড়হর, মাসকলাই ইত্যাদি একসাথে লাগিয়ে চটজলদী বেশ কিছু ডাল, জ্বালানী, পশুখাদ্য ফলিয়ে নিজেদের খাবার ও আয় করেছে।

- রবি মরশুমে যেসব সরকারী বেসরকারী চাষের জমি পড়ে থাকে সেখানে দল বেঁধে পয়রা পদ্ধতিতে (চাষ ও সেচ বিহীন) খেসারী, ছোলা, মটর, মুশুরী, তিসি এমনকি গম, ধনে ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় কোটি টাকার ফসল ঐ সব ব্লক এলাকার পঞ্চায়েতগুলিতে ফলিয়েছে। এতে গরীব মানুষ যেমন কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, বেড়েছে নিজেদের খাবারের যোগান তেমনি পাওয়া গেছে প্রচুর পশুখাদ্য ও জ্বালানী। ইটাহার ব্লকের জয়হাট ও দুর্লভপুর পঞ্চায়েতে ৭৩টি স্বনির্ভর দলের ৮৫১ পরিবার ১১৫ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বা ভাগে চাষ করেছে। তেমনি বীরভূমে তিনটি ব্লকে গত রবি মরশুমে ২,০৭০ বিঘা জমি ৪,৯৭২টি পরিবার দল বেঁধে চাষ করে ১৩,৪০৫ কুইন্টাল বিভিন্ন ফসল ফলিয়েছে।

- উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর ডিম সংগ্রহ করে এনে স্থানীয় দেশী মুরগী দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়ার কাজ স্বনির্ভর দলের মহিলারা করে নিজেদের হাঁস-মুরগীর উন্নয়ন করতে পারে। বাচ্চা বিক্রি করে কিছু আয়ও করেছে। কতজন এ কাজ করবে, কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ ,কখন করা হবে এখনই ঠিক করে রাখতে হবে।

- সরকারী পুকুর ক'টা আছে, কোন কোন দলকে কোনটা লিজ দেওয়া যাবে, পোনা ইত্যাদি কোথা থেকে, কার মাধ্যমে পাবে এখনই পরিকল্পনা করতে হবে। পুকুর ঘিরে বহুমূখী চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনেক কাজ হয়েছে।

- মজা পুকুর জলা কোথায়, কি মাপের কতটি আছে, কিভাবে সংস্কার করা যাবে, কারা শ্রম দেবে, অন্যান্য সহায়তা কারা দেবে, কাদের ব্যবহার করতে লিজ দেওয়া যাবে ঠিক করা। লিজ চুক্তি পত্রও চুড়ান্ত করে রাখা দরকার। এ কাজ ঐ সব পঞ্চায়েতে পুরোদমে চলছে। বীরভূম জেলার ইলামবাজার, লাভপুর ও বোলপুর ব্লকের ১১ টি মজা পুকুর সংস্কার হয়েছে। ১১০ টি পরিবার ১২ বিঘা জলাশয় তৈরী করে ১১ টি দলে চাষ শুরু করেছে। ইটাহার ব্লকে ২টি পঞ্চায়েতে ১৭টি স্বনির্ভর দল ১৩টি (৩৫.৫ বিঘা) পুকুর পঞ্চায়েত থেকে লিজ পেয়েছে, চাষ শুরু করেছে।

- কোন কোন পরিবারের সামান্য সব্জী বাগান করার, ফল গাছ লাগানোর জমি আছে ঠিক করা, এর জন্য কতটা কি লাগবে আনুমানিক ব্যয় ঠিক করা, কিভাবে হবে ঠিক করে নেওয়া। পারিবারিক পুষ্টি বাগান করে খাদ্য ও পুষ্টির উন্নতি হয়েছে।

- যেসব পরিবারের পুষ্টি বাগান করার জায়গা নেই তাদের নিয়ে দল গঠন করে যৌথ বাগান কোথায় কিভাবে করা যাবে ঠিক করা। ভূমিহীন পরিবারগুলি এভাবে খুব উপকৃত হয়েছে। পঞ্চায়েত ও মালিক জমি দিয়েছে।
- কোন কোন সেচের বা নিকাশী নালা সংস্কার করা দরকার, কারা শ্রম দেবে, আর্থিক সহায়তা কে কতটা দেবে ঠিক করা।
- এলাকায় ফল চাষ বাড়ানোর সুযোগ আছে, কি কি কতটা কোথায় করা যাবে, অর্থ, উপকরণ কোথায় পাওয়া যাবে,কখন কাজ শুরু করা হবে, কারা দেখভাল করবে ঠিক করা।

ইত্যাদি আরও কত ছোট ছোট পরিকল্পনা ভাবা যায়।

গ্রাম সংসদ যা করতে চায়
গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তার রূপ দেয়

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাব্য কাজ (১০০দিন গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে কি কি করা যাবে, কিভাবে?)

১। নার্সারী, চারা উৎপাদন
২। কৃষিভিত্তিক বন সৃজন - পতিত জমি, রাস্তা ও খালপাড়, নদীর পাড়, স্কুল/সরকারি পতিত জমি ইত্যাদি
৩। পশুখাদ্যের যোগান বাড়ানোর জন্য বিশেষ ধরণের বৃক্ষরোপন ও বিশেষ ধরণের চারা তৈরী (কাঁঠাল, সুবাবুল, জীবন, পড়াশী, নিম, অর্জুন, শিশু, গ্লিরিসিডিয়া, কাঞ্চন, মাদার, কাসাভা ইত্যাদি)
৪। শ্মশান/গোড়স্থানের পরিসীমা ও পতিত জায়গায় বৃক্ষ রোপন
৫। চা বাগানের পরিসীমাতে বৃক্ষ রোপন
৬। মজে যাওয়া মাছ চাষ ও সেচ পুকুরের সংস্কার
৭। পুকুর পাড়ের ভূমি সংস্কার করে সারা বছর শাক-সবজি চাষের উপযুক্ত করা
৮। বৃষ্টির জল ধরার জন্য নতুন নতুন পুকুর কাটা, সেচ পুকুর তৈরী
৯। বনভূমিতে ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট জল ধারণ ও শোষক চৌবাচ্চা খনন
১০। মাঠ কূয়া- ৫% মডেল
১১। কলসি সেচের জন্য উপযুক্ত কলসি তৈরী (Skill Labour) ও ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর মাটির গামলা তৈরী, বাংলা ইটভাটা (Skill Labour)
১২। পারিবারিক ও যৌথ জল সঞ্চয় ব্যবস্থা (Roof water hervesting Tech)
১৩। সেচ নালা সংস্কার ও খনন
১৪। নিকাশি নালা সংস্কার ও খনন
১৫। সামুহিক পানা পুকুর, খাল, বিল, পরিস্কার করা
১৬। পতিতজলা ভূমি সংস্কার - নিকাশি নালা তৈরী করে চাষ যোগ্য করার কাজ
১৭। মজে যাওয়া ছোট নদী - মরানদী খনন, সংস্কার করে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, নাব্যতা বাড়ানো পরিবহন সুযোগ বাড়ানো, মাছের পোনা ছাড়া
১৮। নদী নালার পাড় বাঁধা- ভাঙ্গা পাড় মেরামত করা, স্পার দেওয়া, গাছ লাগানো/ঘাঁস লাগানো,গালি কন্ট্রোল
১৯। ঢালু জমিতে জল ও ভূমি সংরক্ষণ বাঁধ তৈরী- সমন্নত বা কন্টুর আল
২০। নিচু এলাকায় উচু ও চওড়া আল তৈরী করে নিবিড় চাষের ব্যবস্থা নেওয়া
২১। সোর্জান পদ্ধতিতে এক ফসলী নিচু জমির উন্নয়ন ও বহুমুখী চাষের ব্যবস্থা
২২। পতিত ভূমি চাষযোগ্য করার জন্য সংস্কার
২৩। চা বাগানের সেডটিতে গোল মরিচ চাষ

২৪। গোচারণ ভূমির উন্নয়ন - ভূমি ও জল সংরক্ষণের জন্য আল বাঁধা, উন্নত ঘাস লাগানো/বীজ ছড়ানো
২৫। স্কুলের বাগান - শাক-সব্জি ও ফল
২৬। ডিপলিটার সিস্টেমে মুরগী পালনের বাসস্থান নির্মাণ - স্থানীয় উপকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে
২৭। হাঁস পালনের ঘর - স্থানীয় উপকরণ ও পয়যুক্তি ব্যবহার করে
২৮। গরু/শুকর পালনের বাসস্থান নির্মাণ (স্থানীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি)
২৯। কূয়োর পাড়, কলের পাড় বাঁধানো
৩০। মাতৃ ফল বাগান প্রতিষ্ঠা ও ফল চারা উৎপাদন
৩১। কম্যুনিটি সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ইত্যাদির ঘর (Mud Wall) (উচু এলাকায় - স্থানীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি), বাংলা ইট তৈরী ও ব্যবহার
৩২। বন্যা এলাকায় পানীয় জলের পুকুর সহ আশ্রয় স্থান নির্মাণ - মানুষ ও পশুপাখীর জন্য
৩৩। ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর মডেল তৈরী
৩৪। উন্নত কম্পোস্ট সার তৈরীর গর্ত্ত তৈরী ও ছাউনি তৈরী (স্থানীয় প্রযুক্তি ও উপকরণ)
৩৫। নানাধরণের সার্বজনীন খাদ্যগোলা/শষ্যগোলা তৈরী (স্থানীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি)

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর শক্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কম বেশী সব জায়গাতেই ধীরে ধীরে স্থায়ী স্থান করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া দানা বেঁধে উঠছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে এবং তাদের উদ্যোগে স্বনির্ভর দল গড়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের কাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি সহ ... জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, দক্ষতা ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবিকা বিকাশের সুযোগ আছে ও এসেছে। এই কাজে সহজ, পরিবেশমুখী লোকায়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে লোক কল্যাণ পরিষদ বদ্ধ পরিকর। স্বশাসনের সহায়তা কেন্দ্র হিসাবে লোক কল্যাণ পরিষদের সকল প্রকাশনাই আপামোর জনসাধারণের ক্ষমতা, শক্তি ও জীবনের মানের সমৃদ্ধি ঘটাবে এটাই লক্ষ্য। এই প্রকাশনাটি সেই পথে চলার একটি পাথেয় মাত্র।

লোক কল্যাণ পরিষদ

২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২৬

☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৫৫২৯-১৮৭৮